ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 93- 97
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.201

পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন

সুজন সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 25.08.2024; Accepted: 27.09.2024; Available online: 30.09.2024

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the Second World War, India, then a colony under the British Empire, was drawn into the global conflict. While the British sought Indian support, responses varied: the Communist Party extended cooperation, whereas the Indian National Congress and the Azad Hind Fauj opposed British efforts. These political dynamics, combined with war-related policies, contributed to the catastrophic Bengal Famine of 1943. Scholars have increasingly argued that man-made and artificial factors—rather than purely natural causes— played a predominant role in the crisis.

Women and girls bore a disproportionate share of the suffering during the famine. Cultural norms and patriarchal practices led them to eat last and least within households, heightening their vulnerability to malnutrition and related health complications. Additionally, the famine exacerbated gender-based violence, forced marriages, displacement, and coerced sex work. Educational disruption was common, as girls often dropped out of school to help their families survive. Harrowing accounts— such as women dying on roadsides while their infants unknowingly attempted to nurse— reveal the brutal human toll of this tragedy.

Despite these challenges, research shows that women and girls often have lower mortality rates than men and boys during famines, due to a combination of biological and social factors. However, the societal burden placed upon them was immense. In many cases, men abandoned their families, leaving women to shoulder responsibility alone. As noted by Gopal Halder, the Bengal Famine — which claimed over 3 to 4 million lives — was not just a natural disaster but a catastrophic failure of policy and humanity. Bengali literature from the period reflects this gendered suffering, providing crucial insights into the lived experiences of women during one of the darkest chapters in Indian history.

Keywords: Bengal Famine, Gender, Exploitation, World War II, Malnutrition, Colonialism, Women in Crisis

স্বামী বিবেকানন্দ নারী জাতি সম্পর্কে বলেছেন, “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই, সে-দেশ, সে জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।”[১] অথচ দেশে দেশে, যুগে যুগে নারী সমাজ পদদলিত হয়েছে। যুদ্ধকালে তারা ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। টাকার অভাবে শিশু কন্যা থেকে শুরু করে পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরও বিক্রি করে দেওয়া হত। অথবা যৌনবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য করা হত। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা চিরন্তন। মা নিজে অভুক্ত থেকে সন্তানের জন্য খাদ্য জোগানের চেষ্টা করে গেছে।

এমনও দেখা গেছে যে অনাহারে মা মারা গেছে; অবুঝ সন্তান সেই মৃত মায়ের দুগ্ধ পান করেছে। মন্বন্তর কালে এসব চিত্র শহরের রাস্তায় বা ফুটপাতে অহরহ দেখা গেছে। প্রাচীন যুগ থেকেই মন্বন্তর হয়েছে। কিন্তু সেগুলি ঘটেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে। যেমন-খরা, বন্যা, অথবা ভূমিকম্পের জন্য। কিংবা অন্য কোনো কারণে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে অর্থাৎ ১৯৪২-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যে মন্বন্তর হয়েছিল তা ছিল সর্বাংশেই মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর। ১৩৫০ এর মন্বন্তরের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার, স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। এদের জাঁতাকলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে ঝড়ে পড়েছিল।

মাসিক 'বসুমতি' পত্রিকায় দুর্ভিক্ষের জন্য সরকারের দায়িত্বহীনতা ও ব্যবসায়ীদের অতি লোভকে দায়ী করেছিলেন। "লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া গেল, যাহারা অর্ধমৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে পুণ: প্রতিষ্ঠিত করিবার সুব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।"[২] তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন অসামাজিক নীতি নির্ধারণের জন্য দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত হয়েছিল। বাংলা দেশের গ্রামীণ মানুষজনের সঙ্গে কোনোরূপ সলা পরামর্শ না করেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করেছিল। আর সেগুলি জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের ওপর। যার জন্য মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের কবলে। স্থানীয় জমিদার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছপা হয়নি। তারা চরম কষ্টের সময়ই ব্যাপকহারে কর আদায় শুরু করেছিল। কর দিতে না পারলে তাদের জমিগুলো দখল করে নিত বা ঘর-বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করত। এদিক থেকে পিছিয়েছিল না মহাজনেরাও। তারা সুযোগ বুঝে চাষীদের ধান ও অন্যান্য ফসল কিনে গুদামে মজুত করে রেখেছিল। তারা আকালের আভাস হয়তো আগের থেকেই পেয়েছিল। শুধু বুঝতে পারেনি চাষীরা। তারা সামান্য বেশি দরে ফসল বিক্রি করে দিয়েছিল। তারা বুঝতেও পারেনি দুর্ভিক্ষ সমাগত। ফসল বিক্রির টাকা তো বিভিন্ন জিনিস কিনে শেষ করেদিয়েছিল। ভেবেছিল পরবর্তিতে ফসল এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এর মধ্যেই সব কিছু পালটে যায়। যারা খাদ্য উৎপাদন করে তারাই অভুক্ত থাকে। খাদ্য সামগ্রী মহাজনেরা লুকিয়ে ফেলেছিল গুদাম ঘরে। তৈরি করেছিল কৃত্রিম খাদ্য সংকট। গুদামে খাদ্য মজুত থাকলেও সাধারণ মানুষ সেসব আর কিনতে পারেনি। ব্যবসায়ীরাও সুযোগ বুঝে জিনিসের দাম দিয়েছিল বাড়িয়ে। খোলা বাজার থেকে খাদ্য সামগ্রী উধাও হয়ে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল কালোবাজারি। মানুষের চাল, ডাল অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা হ্রাস পেয়ছিল। সাধারণ মানুষ অসমর্থ হয়ে পড়েছিল।

আর এই মন্বন্তরের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস। সাহিত্যের সেইসব শাখা থেকে আমরা উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্য। মন্বন্তর সমকালীন উপন্যাসে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল; সেগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করাই হল গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি:

সমগ্র গবেষণা পত্রটি বিশ্লেষোণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মূল আলোচনা:

যখনই কোনো দেশে যুদ্ব শুরু হয়েছে, তখনই দেখা গেছে দেশে অরাজকতা। জিনিসের দাম বৃদ্বি পেয়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতে হয়েছে অনাহারে। আর তাতে যদি হয়েছে ঔপনিবেশিক দেশ, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সেই দেশের ধন-সম্পদ লুট হয়েছে। লুট হয়েছে নারীরা। তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ অনবরতই চলেছে। এমনকি বাড়িতে অভাব দেখা দিলে, বাবা-মা তার কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে। কোনো কোনো মেয়েকে বাধ্য করা হয়েছে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে। আবার সে সমস্ত মেয়েরা একটু পড়াশোনা করেছে তারা আবার চাকরি করে বাবা-মা কে সাহায্য করেছে। ১৩৫০ সালে বাংলাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের চরম অরাজকতার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তাতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। খাদ্যের অভাব, দারিদ্য, শোষণ, কালোবাজারি, মজুতদারি, ও মহামারি সব কিছু মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। আর সেই পরিস্থিতিতে পরিবারের নারীরা সবচেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল বঞ্চিত। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে তারা ছিল মূল্যহীন। অভাবের কারণে তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আকালের আভাস পেয়েই পুরুষেরা বাড়ি ছেড়ে যেদিকে খুশি চলে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি নারীরা।

মা তো সন্তানকে ফেলে দিতে পারেনা। স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানের কোনো খোঁজ খবর রাখেনি এমন ঘটনাও ঘটেছে। অথচ স্ত্রীর প্রতি তার শাসন কিন্তু ষোলো আনাই বজায় থেকেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বর্মা দখল নিলে ব্রটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। জাপানকে রুখতে তারা বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ আলোচনা না করেই। তার ফল স্বরূপ এই মন্বন্তর হয়েছিল। আর যার জাঁতাকলে পড়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হয়েছিল। এর সঙ্গে আবার মেদিনীপুর অঞ্চলে সাইক্লোনও যুক্ত হয়েছিল। প্রবল জলোচ্ছাসের কারণে মেদিনীপুর অঞ্চল ভেসে গিয়েছিল প্রচুর মানুষ, গবাদিপশু মারা গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তারা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কুঁড়ে কুঁড়ে মরছিল। কিছু লোক কলকাতায় চলে এসেছিল। মায়েরা সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ভাত ও ফ্যান চেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। কখনো কখনো একটু অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য শিশুটি গাড়ির চাপা পড়ে মারা গেছে। তারপর মায়ের সে কি কান্না! এমনই এক দৃশ্য দেখা যার তারাশঙ্করের মন্বন্তর উপন্যাসে। “মেয়েটি বুক চাপড়ে কাঁদছে—ওরে আমার ধন—ওরে আমার মানিক! ওরে, আমি যে ঝড়ে জলে বাছাকে বাঁচিয়ে রেখেছিনু রে! ওরে বাবারে!”৩

যুদ্ধের সময় সৈন্যদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাড়তি ধান চাল কিনে নেওয়ার হুকুম দিয়েছিল সরকার। তারজন্য তারা প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করেছিল। স্থানীয় এজেন্টরা সুযোগবুঝে জোড় করে গ্রাম-বাংলার সমস্ত ধান চাল কিনে নিয়েছিল। আবার বিভিন্ন স্থানে চাষীদের চাষবাস বন্ধ করে দিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছিল সাইকেল ও নৌকা। ফলে মানূষের অন্ন-সুংস্থানের পথও বন্ধ করে দিয়েছিল। চালের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুরুষেরা যেখানে সংসারের হাল ছেড়ে দিয়েছে নারীরা সেখানে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে সংসার রক্ষা করার দায়িত্ব। শাক-পাতা, বুনো আলু, গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি খেয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টাটুকু তারা করেছে। কখনো কখনো কাঁচা গেঁড়ি, গুগলি খেয়ে শিশুগুলোর মৃত্যুও হয়েছে। অশনি-সংকেত উপন্যাসের মতি মুচিনী বলেছে,

> “...দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাত খাইনি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি গুগলি।...শুধু দ্যাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে, বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। কত মরে গেল ওইসব খেয়ে...।”৪

চাষিদের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী হয়। তারা কাজ ফেলে কখনো বসে থাকে না। গ্রামে যখন সকলের সচ্ছল অবস্থা ছিল তখন তারা ঢেকিতে ধান ভেনে বাড়ির প্রয়োজনের টুকু রাখে বাকি ধামাভরে বাজারে বিক্রি করতো। একসঙ্গে দল বেঁধে যেত চাল বিক্রি করতে। কিন্তু মন্বন্তরের কারণে সে সব দিন অতীত হয়েছে। না খেয়ে আর কতদিন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। মরার চেয়ে বেঁচে থাকা ভালো। আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক নারীরাই বিপথগামী হয়েছে। কথায় বলে ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’। দুর্ভিক্ষের সময় ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। গ্রামের সহজ-সরল মেয়েরা বেছে নিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি। ‘অশনি-সংকেত’ উপন্যাসে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। “কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুল, আঁচলে আধপালি চাল। পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া।”৫

জীবন ধারনের জন্য উপযোগী অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দুর্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য হওয়ার জন্য শহর ও গ্রামীন মানুষের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল, আবার জিনিস পত্রের দামও দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়ায় পরিবারে অর্ধাশন বা অনশনে দিন কাটতে থাকে। চাল, আটা, চিনি, কয়লা ও কেরোসিনের দোকানে নরনারীর ভিড় বাড়তে থাকে দিনকে দিন। কন্ট্রোলে কোনো কোনোদিন আবার শুধু নারীরাই লাইলে দাঁড়িয়ে মাল সংগ্রহ করে। তারা ভোর বেলা থেকে লাইনে এসে দাঁড়ায়। বেলা করে দাঁড়ালে মাল পাওয়া যায় না। দোকানদার চুপি চুপি চোরাবাজারে মাল বিক্রি করে দেয়। লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের কোনো জাত নেই। বিপদে সকলে মিশে একাকার হয়েগেছে। তাদের কোনো ধর্ম নেই, তাদের একটাই ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।

> “সামনেই একটা কন্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। হিন্দু-মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙালী—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ঝিয়ের দল। গৃহস্থ ঘরে বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই, মাস্থার রুখু চুল ঠেলাঠেলিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে উড়েছে, মুখে অপরিসীম উদ্বেগ।”৬

যে বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে বছর কিন্তু চাষিদের ফসল খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ কী ছিল? কারণ ছিল চাষিরা ফসল খেতে থাকতেই দাম বেশি পেয়ে বিক্রি কারে দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল পরবর্তিতে ফসল উঠলেই সব পুষিয়ে নেবে। কিন্তু তাদের সে আশা আর পূরণ হয়নি। তাই তো তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। 'চিন্তামণি' উপন্যাসের একটা গ্রামের দৃশ্য ছিল এরূপ,

> "দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে- মানুষ ও গরুছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশি একা, আরও বেশি অসহায় মনে হয়।"[৭]

একশ্রেণির মানুষ যারা খাদ্য সামগ্রী লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে গেছিল। তৈরি হয়েছিল কালোবাজারি।

> "জিনিসের দর আজ নাকি হঠাৎ লাফ দিয়েছে। চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলেনা। কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এবেলায় গেলে ও বেলার আগে ফেরা যায় না।"[৮]

পরিবারের পুরুষেরা যে রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তাদের স্ত্রী-রাও পরোক্ষভাবে সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কেউ বা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেউ বা সখে রাজনীতি করেছে। উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা কমিউনিস্ট দল, কংগ্রেস দল ও মুসলিম লিগ; এই তিনটি দলেরই উল্লেখ পাই। কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী। তাই মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্মীদের জেলে যেতে হয়েছে। কংগ্রেস করার জন্য স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে জেলে। সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। তার মনে বাসা বেঁধেছে গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনা। কংগ্রেস কর্মীর একজন স্ত্রী বলেছে, তার কাছে টাকা রয়েছে; কিন্তু তার চাল চাই, আটা চাই।

> "-টাকার আর কোন দাম নেই আমার কাছে। আজ তিনদিন ঘরে চাল নেই। তিনদিন আগে নিচের পানওয়ালা কিউয়ে দাঁড়িয়ে চাল এনে আমাকে দিয়েছিল। পরে শুনলাম লোকটার নিজের ঘরে হাঁড়ি চাপেনি। তাই আর তার কাছে নিইনি। আটাও নেই, চিনিও নেই। শুধু আলুর তরকারি আর খেতে পারছি না। ছোট ছেলেটা তো ভাত-ভাত করে দিনরাত চিৎকার করছে।"[৯]

বড়োলোকের মেয়ে হয়েও অনেকে নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। গরীব মানুষের কথা ভাবেনি। অথবা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবেও যোগদান করেনি। তাদের মধ্যে শুধু হিংসা ও ঈর্ষাই ফুটে উঠেছে। তাই তো অনেক সময় নিরপরাধ মানুষের চাকরি কেড়ে নিয়ে একমাত্র খাদ্যের সংস্থান বন্ধ করে দিয়েছে। সংসারে অভাবের জন্য অনেক মেয়ের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে ভালোবাসার মানুষকে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেছে মানুষীর সেবায়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষকে জাগ্রত ও সচেতন করেছে। তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিতে তাদের সাহায্য করেছে ও তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিদিয়েছে।

মন্বন্তরের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে গ্রাম থেকে চলে এসেছিল অনেকেই। তারা ভেবেছিল কলকাতা শহরে আশ্রয় নিলে খেতে পাবে। কেউ বা আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছিল। অথচ তারা যেসব বাড়িতে এসে উঠেছিল একসময় সে বাড়ির অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। না খেতে পেয়ে দিনের পর দিন কষ্ট পেয়েছে। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের পিসিমার তেমনই দুর্দশা হয়েছিল।

> "পিসিমা। -- বড় লক্ষ্মীছাড়া তোমার সংসার অরুণা। শুধু নেই নেই নেই। চাল নেই, ডাল নেই, পুজো-পার্বণ নেই, অতিথি- কুটুম নেই, একটা কচি ছেলের সাড়া শব্দ নেই তোমার বাড়িতে। এত নেড়া সংসারে কি আমার মত মানুষ বাঁচতে পারে অরুণা?"[১০]

বাংলাদেশে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন স্থানে স্থানে বুভুক্ষু নরনারীদের 'গ্রুয়েল' নামক একরকম পাতলা খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। চাল ডাল বাজরা ও জোয়ার একসঙ্গে সিদ্ধ করে এই প্রকার খাদ্য তৈরি হত। এধরনের খাবার খেয়ে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারেনি। অবশ্য বহুস্থানে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমুহ এবং দানশীল ব্যক্তি খাদ্যাদি দান পূর্বক লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেছিল। তাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র থেকে

সাহায্য করা হত। কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ মানুষেরই জীবন রক্ষা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উদ্বোধন পত্রিকায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে বারবার আবেদন করা হয়েছে।

> “বাঙলা দেশের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সকল শাখা আছে, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতেই কোন না কোন আকারে অন্নসংকট সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে। এতড্ভিন্ন বহু সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ বুভুক্ষু নরনারীকে যথাসম্ভব খাদ্যাদি দিতেছেন এবং নানাভাবে তাহাদের সেবা করিতেছেন। কিন্তু কেবল এই প্রকার দানের দ্বারা দেশের শতাংশের একাংশের প্রয়োজনও পুর্ণ হইতেছে না।”[১১]

উপসংহার:

উপরি উল্লিখিত উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তাদের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, কিংবা অনাত্মীয়কেও সাহায্য করেছে দু:সময়ে। কেউ বা রোজগার করে পরিবারের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে সাহয্য করেছে। কেউ বিপদে স্বামীর পাশে থেকেছে, স্বামীর মতাদর্শে বিশ্বাসী থেকেছে। অন্নকষ্টের জন্য স্বামীকে কখনো দায়ী করেনি। কেউ আবার স্বার্থপর। নিজ স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করতেও পিছপা হয়নি। অনেকে আবার খেতে না পেয়ে বিপথে চলে গেছে। কেউ কেউ নারীদের বিপথে ঠেলে দিয়েছে। নারী তো মা তাই তো মা তার সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু পিতা সব ফেলে চলে গেছে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মাকে দেখে গেছে সন্তানের সঙ্গে পড়ে থাকতে। কখনো কখনো অবুঝ সন্তান মায়ের পিছে পিছে যাওয়ার সময় গাড়িতে চাপা পড়ে মারা গেছে, তাতে মায়ের বুক ফাটা কান্নার রোল আকাশে-বাসাতে ভেসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মাকে দেখা গেছে দুটো, তিনটে সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ফ্যান চেয়ে বেড়াতে। কখনো সন্তানকে নিয়ে লঙ্গর খানার লাইনে দাঁড়াতে। এরা তো গ্রাম থেকে এসেছিল, তাই তাদের আসড়য় স্থল হয়ে হয়েউঠেছিল রাস্তাঘাটের ফুটপাত, যা ছিল তাদের একেবারে অচেনা। তাই তো তারা সন্তানকে রেখে কোথাও যাওয়ার সাহস পায়নি। ওপন্যাসিকেরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক এভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী, বিবেকানন্দ। আমার ভারত অমর ভারত। ১৫ তম মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী সুপর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড কলকাতা, পৃ. ২৬।
২. চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ। ভারতবর্ষ পত্রিকা, উপোসিবাংলা, সাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৭, গৌতম মিত্র কর্তৃক সেরিবান, বাখরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৭৭ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১৩৯।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ২৬।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। অশনি – সংকেত। প্রথম ‘মিত্র ও ঘোষ’ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত, পৃ. ১১৫।
৫. তদেব, পৃ. ১২৮।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ২৮।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। চিন্তামণি। মানিক উপন্যাস সমগ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৮, প্রকাশক রতন লাল রায়, যুথিকা বুক স্টল, ১২ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৪৭।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলিকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৮৩।
৯. তদেব, পৃ. ১৮৪।
১০. ঘোষ, সুবোধ। তিলাঞ্জলি। সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৪, জানুয়ারি ১৯৯৮, সম্পাদক, উত্তম ঘোষ, সমীরকুমার নাথ, নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ. ৩০৫।
১১. স্বামী, সুন্দরানন্দ সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা, ৪৫শ বর্ষ, (১৯৪৯ মাঘ হইতে ১৩৫০ পৌষ), উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ৪৩৭/৪৩।